Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

[illegible]

(ক) পরিচালক [illegible]

(খ) পরিচালক [illegible]

(গ) পরিচালক [illegible]

(ঙ) পরিচালক [illegible]

(ঙ) পরিচালক [illegible]

(চ) সিস্টেম এনালিস্ট

(ছ) উপপরিচালক [illegible]

মহাপরিচালক

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

“জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু”

GI Journal No. 64

Published on : 10 DEC 2025

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য-জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে॥

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়ন-পূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবেঃ

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-১২
আবেদনের তারিখ: ০৭-০৩-২০১৭ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু" যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নামঃ "জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু"

শ্রেণিঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট।
খ) ঠিকানা ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের আংশিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার কন্দাল ফসল (শ্রেণি: ৩১)।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১. জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু উৎকৃষ্ট মানের একটি কন্দাল ফসল।
২. লতিরাজ পানিকচুর একটি উন্নত স্থানীয় জাত।
৩. এই কচুর প্রায় সব অঙ্গই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়।
৪. লতিরাজ কচু থেকে বছরের ৭-৮ মাস পর্যন্ত লতি পাওয়া যায়।
৫. প্রতি হেক্টরে লতি হয় ২৫-৩০ টন এবং রাইজোম (কান্ড) হয় ১৫-২০ টন।
৬. লতিরাজ কচুর লতির দৈর্ঘ্য ৪০-৬০ সেন্টিমিটার।
৭. এই লতি গোলাকার, গাঢ় সবুজ ও অপেক্ষাকৃত মোটা হয়ে থাকে।
৮. রান্নার সময় প্রায় একই সাথে সিদ্ধ হয়।
৯. লতিরাজ কচুর লতি খেলে গলা চুলকায় না।
১০. এই কচুর লতি ও কান্ড বা রাইজোম অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।
১১. এ জাতীয় কচুর গাছ মাঝারি, পাতা সবুজ।
১২. এ কচু জমিতে লাগানোর ২ মাস পর থেকে ৭/৮ মাস পর্যন্ত লতি দেয়।
১৩. কচুর লতি ও কচুতে প্রচুর ভিটামিন এ ও লৌহ থাকে। তাছাড়া শর্করা, আমিষ ও আঁশ থাকে।
১৪. অন্য যে কোন জাতের কচুর লতির চেয়ে জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর লতি প্রায় সবদিক থেকেই স্বতন্ত্র। ফলনও হয় বেশি।
১৫. জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর লতির ফলন, পুষ্টিমাণ, ভক্ষণ গুণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু একটি কন্দাল ফসল। এটি জয়পুরহাটরে অন্যতম একটি অর্থকরি ফসল। লতিরাজ কচু প্রায় সারাবছরই উৎপাদন হয় । তবে শীতকালে ফলন কম হয়। অর্থাৎ লতিরাজ কচু শীত সহ্য করতে পারে না। তাই শীতের মৌসুমে পাতাগুলো মরতে থাকে এবং ফলনের পরিমাণ কমে যায়। এই কচুর প্রায় প্রতিটি অঙ্গই খাওয়া যায়। তবে এর প্রধান ব্যবহৃত অঙ্গ হচ্ছে লতি। কচুর রাইজোম বা কান্ডের প্রায় সবটাই থাকে মাটির উপর। রাইজোম বা কাণ্ড শাখান্বিত নয়। কান্ডের আইক থেকে বছরে অন্তত ৭/৮ মাস লতি বের হয়। লতিরাজ কচুর লতির দৈর্ঘ্য সাধারণত ৪০-৬০ সেন্টিমিটার, লতি গোলাকার, গাঢ় সবুজ ও অপেক্ষাকৃত মোটা হয়ে থাকে। এগুলো লতিরাজ চেনার উপায়।

জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর ফলন অন্য যে কোনো কচুর লতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। এই জেলায় হেক্টরের পর হেক্টর এলাকা জুড়ে চাষ হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২০২২-২৩ খ্রি. মৌসুমে ১২৫০ হেক্টর জমিতে এ জাতীয় কচুর চাষ হয়েছিলো। প্রতি বছর বাড়ছে লতিরাজ কচুর চাষাবাদ এলাকা। এটি জমিতে রোপণের পর সাধারণত ২ মাস পর থেকে লতি ফলন দিতে শুরু করে যা অন্তত ৭/৮ মাস পর্যন্ত নিয়মিত ফলন দেয়। লতি দেওয়ার সময় শেষ হলে কয়েক স্তরে ফুল পাওয়া যায় এবং পরে কাণ্ড বিক্রি করে অর্থ উর্পাজন করতে পারে কৃষকগণ।

জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর রাইজোম বা কাণ্ড হয় খাটো তবে ফলন হয় অধিক। লতিরাজ কচু খরিপ মৌসুমের ফসল। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি সময়ে ফসল লাগানো হয়। তবে আগাম ফসল পেতে হলে শীত আসার পূর্বে চারা রোপণ করতে হয়। শীতের সময় চারা বৃদ্ধি ধীর থাকে তবে গরম আসার সাথে সাথেই গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং আগাম লতির ফলন পাওয়া যায়। লতিরাজ কচু সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও রপ্তানীযোগ্য হওয়ার কারণে সহজে জনপ্রিয় হয়েছে জয়পুরহাটের কৃষকের নিকট। জেলার প্রধান শস্য ও রপ্তানী যোগ্য পণ্য হচ্ছে লতিরাজ কচুর লতি।[১]

জয়পুরহাটের পানিকচুর জাত যা স্থানীয়ভাবে লতিরাজ কচু নামে পরিচিত। এই কচুর লতি এখন দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের ২৫টি দেশে রপ্তানী হচ্ছে। জেলা ব্র্যান্ডিং হিসেবেও স্থান পেয়েছে জয়পুরহাটের স্থানীয় জাতের লতিরাজ কচুর লতি।[২] যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশে যাচ্ছে জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর লতি।[৩] এখানে উল্লেখ্য যে, পাঁচবিবি উপজেলা হতে এই কচুর লতি সরাসরি ইউরোপে রপ্তানি করা হয়। ইউরোপে বিভিন্ন শহরের বাঙালীদের প্রিয় খাবার লতিরাজ কচুর লতি।[৪] জয়পুরহাট জেলায় ৬৮ ভাগ ভূমি মাঝারি উঁচু বরেন্দ্রভূমি। এই মাটি শুষ্ক মৌসুমে শক্ত হয়ে ওঠে এবং বর্ষা মৌসুমে কাঁদাযুক্ত হয় যা অন্য কোন শস্য বপনের উপযোগী নয়। এ কারণে এই এলাকায় বিভিন্ন শাকসবজি চাষের সম্প্রসারণ সম্ভবনা কম। এসব কারণে এই জেলায় চাহিদার তুলনায় শাকসবজি কম আবাদ হয়। যেহেতু বর্ষা মৌসুম কাঁদাযুক্ত হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহ করে উক্ত জমি কাঁদাযুক্ত রাখা যায় তাই পাঁচবিবি, জয়পুরহাট সদর ও আক্কেলপুর উপজেলার কৃষকরা লতিরাজ কচু চাষে ঝুকছে।

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলায় অনেক আগে থেকেই কচুর চাষাবাদ ছিল। এক সমীক্ষা হতে দেখা যায়, ১৯৭৫-৭৬ সালে ৬৯০ একর জমিতে লতি এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে ৭৯৫ একর জমিতে কচু আবাদ হয়েছে। তখন বাণিজ্যিকভাবে কচুর চাষাবাদ ছিল না। তাই স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ছিল "যার নেই কোন গতি সে খায় কচুর লতি"। আবহাওয়া ও মাটির উপযোগীতার কারণে ঐ এলাকায় কচুর চাষাবাদ কেন্দ্রীক একটা অর্থনীতি তৈরি হয়। যার ফলশ্রুতিতে জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার কৃষকগণ তাদের স্থানীয় জাতের অধিক লতি উৎপাদনশীল জাতটি লতিরাজ অভিহিত করে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ শুরু করেন। জয়পুরহাটে লতিরাজ কচুর লতি চাষাবাদ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি জেলা ব্র্যান্ডিং ও জেলা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর লতির খাদ্য ও পুষ্টিগুণ ঃ

১. লতিতে হজমযোগ্য আঁশের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে হজমে সাহায্য হয়।

২. পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং বড় অপারেশনের পর হজমে উপকারি পথ্য হিসেবে কাজ করে।

৩. ডায়াবেটিসের রোগিদের জন্য এটি উপকারি সবজি।

৪. লতিরাজ কচুর লতিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়।

৫. সবজি হিসেবে কচু ও লতি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

পাঁচবিবি, জয়পুরহাট সদর ও আক্কেলপুর উপজেলার প্রায় ১২৫০ হেক্টর জমিতে লতিরাজ কচুর চাষ হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি চাষ হয় পাঁচবিবি উপজেলায়। কেবল পাঁচবিবিতেই সাড়ে ৯০০ হেক্টর জমিতে লতিরাজ কচুর লতি চাষ হয়। জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার একটি জমজমাট বাজারের নাম 'বটতলি বাজার'। গত ৩০ বছরেরও অধিক সময় ধরে এই বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় লতিরাজ কচুর লতি। তাই স্থানীয়ভাবে বটতলি বাজারের নাম প্রচলিত হয়েছে লতিহাট বা লতিবাজার নামে। বাজারে থাকা দোকানের সাইনবোর্ডগুলোতেও লতিহাট অথবা লতিবাজার লিখতে দেখা যায়।

চিত্র ১ঃ জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু এর উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

পাঁচবিবি উপজেলার কিছু কৃষক খাদ্যের অভাব এর তাড়নায় পানিকচু হতে উদ্ভাবিত লতি খাওয়া শুরু করেন। যার বেশিরভাগেরই গলা ধরা সমস্যা ছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে গলাধরামুক্ত কচু তারা আলাদা করে তা লালন-পালন করতে থাকেন। আশ্বিন-কার্তিক মাসের অভাবের সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি অংশের লোক এ সব কচু ও কচুর লতি খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। সে সময় কচু খাওয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে বা ঘৃণার চোখে দেখা হতো; সে জন্য তখন এটির বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়নি আর কচুর পুষ্টিমান সম্পর্কে তাদের কোন ধারনাই ছিল না।

জয়পুরহাট জেলার ব্র্যান্ডিং বুক থেকে পাওয়া যায়, "জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার পাটাবুকা গ্রামের ভূমিহীন কৃষক আমির আলি প্রায় ৩০ বছর আগে জেলায় প্রথম চাষ শুরু করেছিলেন সাদা জাতের লতিরাজ নামের বিশেষ ধরনের কচু। যেগুলো ছিল লম্বা এবং মোটা। সামান্য কয়েকটি লতিতেই কেজি হয়ে যায়। এতে ভালো লাভ হওয়ায় দ্রুত নজর কাড়ে কৃষকের। বছরের প্রায় ১০ মাসই এর উৎপাদন হওয়ার পাশাপাশি স্বাদে ও পুষ্টিতে সেরা হওয়ায় খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে এই লতি। দশ বছর আগে কৃষক আমির আলি মারা গেলেও জেলায় তার উৎপাদিত পানিকচুর লতি কৃষকদের দরিদ্রতাকে জয় করেছে। পানিকচুর লতি স্বাস্থ্যসম্মত, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হওয়ায় জেলায় বর্তমানে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজির তালিকায় স্থান পেয়েছে।"

ফিরোজ হোসেন ফাইনের সম্পাদনায় 'জন্মভূমি জয়পুরহাট' বইটির ৭০ এবং ৭১ পৃষ্ঠায় জয়পরহাটের পানিকচুর লতি বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, "অল্প খরচে বেশি লাভবান হওয়ায় দিন দিন উপজেলায় (পাঁচবিবি) এই পানিকচুর চাষাবাদে আগ্রহ বাড়ছে উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকদের। ফলে একদিকে যেমন লাভবান হচ্ছে কৃষক অন্যদিকে বিদেশে রপ্তানির মধ্য দিয়ে বাড়তি অর্থ যুক্ত হচ্ছে দেশের জাতীয় রাজস্ব আয়ের কিছু অংশে। বর্তমানে পাঁচবিবির পানিকচুর লতি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, কানাডা, ইংল্যান্ড ও ডেনমার্কসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।"

বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা থেকে জয়পুরহাট নিয়ে ২০১৪ সালে প্রকাশিত বইয়ের ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠায় জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "জয়পুরহাট জেলায় লতিরাজ কচুচাষ সম্প্রসারণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এক হেক্টর জমিতে ২৫-৩০ টন লতি এবং ১৮-২০ টন রাইজোম বা কাণ্ড পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য প্রায় ২,৪০,০০০ টাকা। বর্তমানে জয়পুরহাট জেলায় পানিকচুর লতি ও কাণ্ড বা রাইজোম রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ হচ্ছে। কারণ লতিরাজ কচু চাষে রোগ ও পোকা কম লাগে। ফলে কীটনাশক ব্যবহার কম হয়। বর্তমানে এ জেলায় ২০-২৫ হাজার মেট্রিক টনের মতো পানিকচুর লতি উৎপাদিত হচ্ছে। পানিকচু জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানার মধ্যে উৎপাদিত অন্যতম একটি সবজি। এটি চাষে এ অঞ্চল দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করছে।"

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

চারা প্রস্তুত

কচুর গাছ থেকেই কচুর চারা পাওয়া যায়। চারা দুইভাবে পাওয়া যায়।

১. প্রতিটি কচুর লতির কয়েকটি করে গিঁট থাকে। এসব গিঁট থেকে একটা করে চারা গজায়। এই চারাগুলো জমি থেকে সরিয়ে অন্যত্রে ২-৩ ইঞ্চি পর পর রোপণ করা হয়। ৩ মাসেই জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়ে যায় চারাগুলো। গিঁট থেকে গজানো চারাগুলো বেশ শক্তিশালী হয় এবং ফলন দেয় লম্বা সময়।

২. মূল কাণ্ড কেটে যে মোথাগুলো পাওয়া যায় তা থেকে দ্রুত সময়ে লতি পাওয়া যায়। তবে এই পদ্ধতি খুব একটা জনপ্রিয় নয়। মূলত জমি পরিবর্তনের সময় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

জমি প্রস্তুত

প্রথমে ট্র্যাক্টর/পাওয়ার টিলার অথবা গরুর হাল দিয়ে পানিসহ জমি ২টি চাষ দিতে হয়। এরপর প্রতি বিঘা জমিতে ৮০ মন গোবর ছিটিয়ে ৪ দিন রেখে দিতে হয়। এতে করে মাটির সাথে গোবর মিশে গিয়ে জমি উর্বর হয়। তারপর আবারও দুটি চাষ দেওয়া হয়। কেউ কেউ ঐদিনই পানিকচুর চারা রোপণ করে থাকে। তবে আদর্শ পদ্ধতি হচ্ছে একদিন পর চারা রোপণ করা। এতে করে মাটি কিছুটা শক্ত হয়। এর ফলে শ্রমিক কম লাগে এবং চারা রোপণের পর তা ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

জমি প্রস্তুত হওয়ার পর জমির এক মাথা থেকে অন্য মাথায় রশি টানানো হয় এবং চারা রোপণ করা হয়। চারা থেকে চারার দূরত্ব হয় ২০ ইঞ্চি আর সারি থেকে সারির দূরত্ব হয় ২৪ ইঞ্চি। প্রতি বিঘায় চারা বপন করতে হয় ৪৫০০-৪৮০০টি পর্যন্ত।

রোপণের সময়

মূলত দুই মৌসুমে রোপণ করা হয় লতিকচু। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পানিকচুর চারা রোপণ করলে ৪০ দিন বয়সে লতি ছাড়তে শুরু করে। আর অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে বপন করলে ৬০-৬৫ দিন বয়সে লতি ছাড়তে শুরু করে। শীতকালে কচু গাছ তেমন বাড়ে না। তবে গরম আসার সাথে সাথেই প্রচুর পরিমাণে ফলন দিতে শুরু করে। বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য এটি খুবই ভালো সময়।

পরিচর্যা

লতিরাজ কচুর লতি চাষে চারা রোপণের সময় প্রতি বিঘায় ১৫ কেজি টিএসপি, ১৫ কেজি এমওপি, ১০ কেজি ইউরিয়া, ২ কেজি জিংক সালফেট ও এক কেজি রবিক এসিড প্রয়োগ করতে হয়। এরপর ৪৫দিন পর আবারও প্রতি বিঘায় ২০ কেজি টিএসপি, ১৫ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়। লতি তোলা শুরু হলে ৭ দিন পর পর বিঘা প্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া ও ১ কেজি করে ম্যাগনেশিয়াম দিতে হয়। যা লতির ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এই ভাবে ৫ সপ্তাহ সার প্রয়োগ করতে হবে। মাঝে মাঝে ইউরিয়ার সাথে এমওপি সারও প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ পুরো মৌসুমে জমিতে এমওপি সার প্রয়োগ করা হবে ৪ বার।

পানিকচু চাষে মাটি সবসময় ভিজা রাখতে হয়। মাটি শুকিয়ে গেলে এবং বৃষ্টির পানি না থাকলে সেচ দিতে হয়। কখনো কখনো ৪ দিনে একবার সেচ দিতে হয় আবার কখনো কখনো ৭-৮ দিন পর দিতে হয়। মূলত মাটি শুকিয়ে যাওয়ার উপর তা নির্ভর করে। দীর্ঘ জলাবদ্ধতায় লতির ফলন কমে যায়। তাই পানি বেশি আটকে না রেখে কেবল মাটি ভিজা রাখলেই হয়। এ কারণে গাছ বড় হয়ে গেলে চারপাশ থেকে মাটি দিয়ে কাণ্ড ঢেকে দেওয়া হয় এবং দুই সারির মাঝে যে নালা তৈরি হয় তাতে পানি সরবরাহ করা হয়।

সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হয় পানিকচু। মূলত চারা লাগানোর ৩ মাস পর্যন্ত আগাছা বাড়তে থাকে। এরপর গাছ বড় হয়ে যখন মাটিতে রোদ পড়া কমে যায় তখন থেকে আর তেমন আগাছা দেখা যায় না।

ফলন

ফলন দেওয়া শুরু করলে প্রতি ১০ দিনে একবার লতি তুলতে হয়। ২-৩ কিস্তি লতি তোলা যায় ১০ দিন পর পর। এরপর ৭ দিন পর পর লতি তোলা যায় ৪-৫ কিস্তি। গাছ বড় হয়ে গেলে এবং কাণ্ড থেকে লতি ছাড়তে শুর করলে ৫ দিন পর পর লতি তুলতে হয়। এই সময়টাতে কেউ কেউ বাছাই করে বড় লতিগুলো সপ্তাহে দু'বার তুলে থাকে। বিশেষ করে যাদের জমির পরিমাণ কম।

লতি তোলার পর বাসায় নিয়ে মোটা এবং চিকন লতি আলাদা করা হয় এবং এক কেজির আটি বাঁধা হয়। মোটা লতির অপেক্ষায় চিকন লতি কেজি প্রতি ৭-১২ টাকা বেশি দামে বিক্রি হয়। আড়ৎদার শ্রমিক দিয়ে লতির গোড়ার অংশে থাকা মরা খোসাটুকু পরিষ্কার করে নেয় এবং ১ কেজির ৫টা আঁটি একত্রে বাঁধে। পরে এভাবে ৫ কেজির ২০টি আঁটি অর্থাৎ ১০০ কেজি একসাথে কলাপাতা ও সুতলির সাহায্যে বেঁধে বস্তায় করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়।

বাজারের চাহিদার উপর নির্ভর করে লতির দাম কম বেশি হয়ে থাকে। তবে প্রতি কেজি ৩০ টাকার কমে কখনো বিক্রি হয় না। মৌসুমের শেষ দিকে পানিকচু গাছের রাইজোম বা কাণ্ড থেকে ফুল পাওয়া যায়। একেকটা গাছ থেকে ফুল পাওয়া যায় ৩ বার। প্রতি কেজিতে ফুল প্রয়োজন হয় ২০-২৫টি। এক কেজি ফুলের দাম পাইকারি ৩০ টাকা হয়ে থাকে। লতি ও ফুল শেষ হলে পানিকচুর কাণ্ড বা রাইজোম তথা গাছ বিক্রি করা যায় ২-৩ টাকা দরে। তবে কৃষক সবসময় কচুর রাইজোম বিক্রির অপেক্ষায় থাকে না।

প্রতি বিঘা কচু চাষে শ্রমিক লাগে ৬৫-৭০ জন। সব মিলিয়ে প্রতি বিঘায় খরচ হয় ১৮-২২ হাজার এবং বিক্রি করা যায় ৭০-৮৫ হাজার টাকা।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

১. জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু গোলাকার, সবুজ রং বিশিষ্ট এবং লম্বা ৪০-৬০ সেন্টিমিটার।

২. লতি সংগ্রহের ৩/৪ দিন পর পর্যন্ত রং এর উজ্জ্বলতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

৩. সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকায় না।

৪. মলিকুলার অ্যানালাইসিসে স্পষ্টত দেখা যায় যে জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর জাতটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৮৮ সালে অবমুক্তায়িত বারি পানিকচু ১ ও অপর একটি বারি পানিকচু ৬ জাত হতে জেনেটিক্যালি ভিন্ন।

৫. কেমিক্যাল অ্যানালাইসিসে দেখা যায় গলাধরা মুক্ত বারি পানিকচু ১ জাতের লতিতে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের পরিমাণ ৯.৯২% এবং টেস্ট স্যাম্পল জয়পুরহাটের লতিরাজ কচুর লতিতে ৮.৬৫%।

৬. জিন পর্যায়ে পার্থক্য নির্ধারণের জন্য জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত অন্য দুইটি জাতের কচি পাতা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ডিএনএ এক্সট্রাকশন কিট ব্যবহার করে ডিএনএ সংগ্রহ করা হয় এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ১৫টি মার্কার ব্যবহার করে পলিমারেজ চেইন রিয়্যাকশন (PCR) সম্পন্ন করা হয়। এরপর ৪টি মার্কার (Ce_CelA06, Ce_CelC06, Ce_HK34, Ce_HK26)-এর ইলেকট্রোফোরেসিস জেল রান হতে দেখা যায়, জয়পুরহাটের লতিরাজ কচু জাতটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত অন্য জাতগুলো হতে স্পষ্ট আলাদা। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কচুর প্রত্যেকটি জাতের জেনেটিক লেবেলে পার্থক্য আছে।

ট) ব্যবহারকাল ঃ

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার কয়েকটি গ্রামের কৃষক বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ শুরুর আগে থেকেই সেখানে পানিকচুর চাষ করে কৃষকরা নিজেদের সবজির চাহিদা পূরণ করে থাকেন। প্রায় ৩০ বছর আগে শখের বসে পাঁচবিবির পাটাবুকা গ্রামের ভূমিহীন কৃষক লুৎফর রহমান ও আমির আলী পরীক্ষামূলকভাবে লতিরাজ কচুরলতি চাষ শুরু করেন। অল্প সময়ে উৎপাদন ও লাভ দ্বিগুণ হওয়ায় এর বাণিজ্যিক চাষ গতি পায়। উপজেলার পশ্চিম বালিঘাটা গ্রামের কৃষক সুজন মণ্ডল (৩৫) বলেন, এক বিঘা জমিতে কচুরলতি চাষ করতে সবকিছু মিলিয়ে খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। প্রতি মৌসুমে এক বিঘায় ৭০ থেকে ৮০ মণ কচুরলতি উৎপাদন হয়। প্রতি বিঘায় লতি ছাড়াও কাণ্ড উৎপাদন হয় ৩ হাজার ৩০০ থেকে ৩ হাজার ৫০০টি। খরচ বাদে বিঘাপ্রতি ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা লাভ হয়। দুই মৌসুমে লতিরাজ কচু চাষ হয় ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি এবং এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত। কচু চাষের এক-দুই মাস পর থেকে প্রায় সাত-আট মাস লতি বিক্রি হয়। মৌসুমের চার মাসে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ টন লতিরাজ কচু কেনাবেচা হয়। বাকি আট মাসে বিক্রির পরিমাণ দৈনিক ৫ থেকে ৬ টন।

ঠ) বাণিজ্যিক এলাকা ঃ

জয়পুরহাট জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলার পাঁচবিবি ও সদর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি লতিরাজ কচু চাষ হয়। পাঁচবিবির শিমুলতলী, দরগাপাড়া, আয়মারসুলপুর, বালিঘাটা, কড়িয়া, বেলুকুরস বাগজানা, ধরঞ্জি, স্লুইচ গেটসহ উপজেলার বিভিন্ন ডোবা ও নিচু জমিতে লতিরাজ কচু চাষ হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে পাঁচবিবির পৌর এলাকার বটতলীতে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা নিজ উদ্যোগে কচুর হাট গড়ে তুলেছেন। । ১৯৯৮ সালে কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের নজরে আসে লতিরাজ কচু। বিভিন্ন এলাকা থেকে এই বাজারে কচুরলতি বিক্রি করেন কৃষকরা। বটতলী লতি বাজারের ব্যবসায়ী মেহেদী হাসান বলেন, বিশ্বের ২৫টি দেশে কচুরলতি, কাণ্ড, ডাঁটা ও ফুল রপ্তানি হচ্ছে। এগুলো বিদেশে পাঠানোর আগে প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে তিন শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। এতে এলাকার অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ফলে এ জেলার পাশের নওগাঁ ও দিনাজপুরেও ছড়িয়ে পড়ছে লতিরাজ কচু চাষ।

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত কচুসহ অন্যান্য কন্দাল ফসল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কচু নামের পণ্যটি জন্মায়। বাংলাদেশেও অনেক জাতের কচু আছে। তাই জয়পুরহাট জেলার উৎকৃষ্টমানের লতিরাজ কচু (স্থানীয় নাম) জাতটি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসাবে নিবন্ধন করার নিমিত্তে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর-কে অবহিত করা হলে তারা পণ্যটি পরিদর্শনপূর্বক তাদের মতামত প্রদান করেন।

ভৌগোলিক নির্দেশক ফসলের ছবি

ছবি-১: সদ্য রোপণ করা লতি উৎপাদি পানিকচুর গাছ

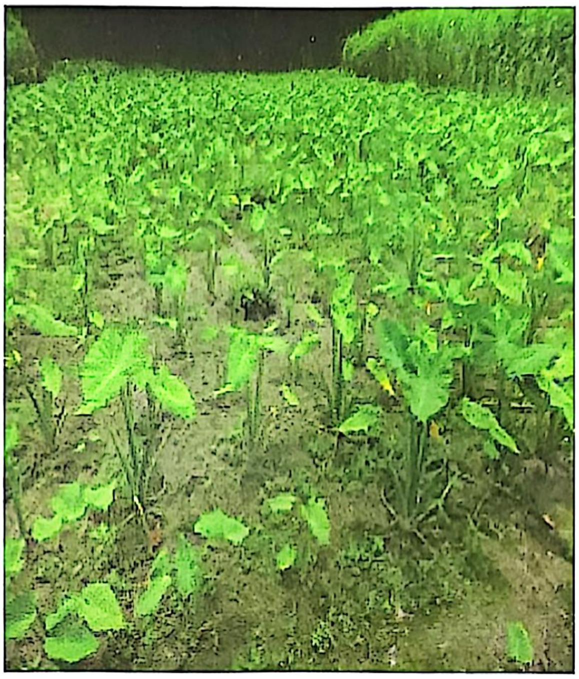

ছবি-২: দেড় মাস বয়সী লতি উৎপাদি পানিকচুর গাছ

ছবি-৩: ৮ মাস বয়সী লতি উৎপাদি পানিকচুর গাছ

ছবি-৪: ১ কেজির ৫টি করে লতির আঁটি বাঁধাই করছে শ্রমিক

ছবি-৫: কৃষকের লতি বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর জন্য একত্রিত করা হচ্ছে

ছবি-৬: লতিরাজ কচুর ফুল

ছবি-৭: বিভিন্ন স্থানে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে লতিরাজ

ছবি-৮: বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা লতিরাজ কচুর রাইজোম

ঢ) উৎপাদকের তালিকা ঃ

মোঃ আজিজার রহমান পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01715 508082	মোঃ মজিবর রহমান পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01733 423278	মোঃ সুন্দর মিঞা পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01726 256664
মোঃ ইমরান হোসেন পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01753 683420	মোঃ মেহেদি হাসান পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01881 466660	মোসাঃ নাসিমা আক্তার পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01767 458242
মোঃ কামরুল হাসান পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01831 325860	মোঃ বুলবুল মিয়া পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01303 689434	তাহেরা আক্তার পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01781 517035
জান্নাতুন বেগম পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01845 030251	খালেকা বেগম পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01768 140200	মোঃ নুর উদ্দিন পাটাবুকা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01715 508082
মোঃ দুর্লভ মন্ডল পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01767 458242	মোঃ মান্নান পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01720 413789	মোঃ সুমন পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01705 001800
মোঃ রাজু পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01728 658384	মোঃ তালেব আলী পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01729 433128	মোঃ মওলা পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01918 280471
মোঃ নূর ইসলাম পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01925 724056	মোঃ আমিনুর পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01789 861640	মোঃ রাকিব মিয়া পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01930 914645
মোঃ আসরাফ মিয়া পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01737 661480	মোঃ আজিজ মিয়া পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01923 776061	মোঃ জলিল মিয়া পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01737 503015
মির শাহিদ পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01305 453017	মোঃ মজনু মিয়া পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01962 624052	জাবুল মিয়া পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01918 415927
মজিদ মিয়া পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01757 451854	মোসাঃ সুবাসি পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01316 037313	রত্না রানী পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01780 412033
নসিতা রানী পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01755 978931	রিমলা বেগম পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01749 126448	ধিরেন মাহত পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01321 512934
	মোঃ সাইমাঈল হোসেন পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 01956 394147	

গ) তথ্যসূত্র ঃ

১. উইকিপিডিয়া
https://bn.wikipedia.org/wiki/জয়পুরহাট জেলা

২. Deepto Krishi/দীপ্ত কৃষি-লতিরাজ কচুতে সবুজ বিপ্লব/জয়পুরহাট, পর্ব ৫৬৮। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮
https://www.zoutube.com/watch?v=s-w6-zPnBVE

৩. বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা । জয়পুরহাট । প্রথম প্রকাশ ২০১4
পৃষ্ঠা ৩৬ ও ৩৭

৪. জেলা ব্র্যান্ড বুক। জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট । প্রথম প্রকাশ ২০১৮
পৃষ্ঠা ৯১-১০৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২১)

৫. সবজি বিজ্ঞান । লেখক মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ । প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ।
পৃষ্ঠা ৪৪৩ ও ৪৫২

৬. কৃষি প্রযুক্তি হাতবই । বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট । নবম সংস্করণ
পৃষ্ঠা ৪৩

৭. জন্মভূমি জয়পুরহাট । ফিরোজ হোসেন ফাইন । প্রথম প্রকাশ ২০২১
পৃষ্ঠা ৭০ ও ৭১

৮. পানিকচু বাণিজ্যিক চাষাবাদ প্রযুক্তি ।কৃষি তথ্য সার্ভিস
http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/
১৪২৬/অগ্রহায়ণ/পানিকচু%২০বাণিজ্যিক%২০চাষাবাদ%২০প্রযুক্তি

৯. জয়পুরহাটের কচুর লতি এখন দেশ ছাড়িয়ে বিশ্ববাজারে । আধুনিক কৃষি খামার । ২৮ জুলাই ২০১৯
https://akkbd.com/জয়পুরহাটের-কচুর-লতি-এখন-দ/

১০. সোনালি মুরগি-লতিরাজ জয়পুরহাটের গর্ব আজ। জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট
https://www.jozpurhat.gov.bd/bn/site/district_brand ing/Ne4m-
সোনালি-মুরগিলতিরাজ-জয়পুরহাটের-গর্ব-আজ

১১. Deepto Krishi/দীপ্ত কৃষি- লতিরাজ কচু ও পটলের বাম্পার ফলন। জয়পুরহাট। deepto tv ।
৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯
https://www.zoutube.com/watch?v=3wWjGvPz_Ro

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-ক-১৯৫/২০২৫-২০২৬/(শিল্প)-২০-১১-২০২৫-১২০ বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.